০৪-১০-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা তোমাদেরকে সকল প্রকার বিষম খাওয়া থেকে রক্ষা করতে এসেছেন। তোমরা এখন এই শোক বাটিকা থেকে অশোক বাটিকায় যাচ্ছ, এই বিষয় বৈতরণী নদী পার হচ্ছ।"

প্রশ্নঃ- স্মরণ করতে বসলে কোন্ কোন্ বিষয়ের জন্য বিঘ্ন আসে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ের জন্য বিঘ্ন আসে না?

উত্তরঃ- স্মরণ করতে বসলে আওয়াজ কিংবা শোরগোলের জন্য কোনো বিঘ্ন আসে না, এইগুলো জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। কিন্তু স্মরণ করার সময়ে মায়ার বিঘ্ন অবশ্যই আসে। স্মরণ করার সময়েই মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে, অনেক রকমের সংকল্প-বিকল্প নিয়ে আসে। তাই বাবা বলেন - বাচ্চারা, সাবধান থাক। মায়ার কাছে ঘুঁষি খেও না। যে শিববাবা তোমাদেরকে অপার সুখ দেন, যিনি হলেন সর্ব সম্মন্ধের স্যাকারিন - তাঁকে খুব ভালোবাসার সাথে স্মরণ কর। স্মরণের প্রতিযোগিতায় খুব জোরে দৌড়াও।

গীতঃ- হে রাতের পথিক, ক্লান্ত হয়ো না...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা প্রতিযোগিতা করছে। কেউ যদি বসে থাকে তাহলে সে যাত্রা করছে বলা হয় না। কিন্তু এই যাত্রা খুবই আশ্চর্যজনক। শান্তির যাত্রা, শান্তিধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা। রাবণের রাজ্যে তো বিষম খেয়ে মরেই যায়। সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনীতে আছে মৃত্যুর পরেও সাবিত্রী সত্যবানের আত্মাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। বাস্তবে এইরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। অর্ধেক কল্প ধরে মরণ আসে। অন্তিম সময়ে বিষম খেতে থাকে। এটাও জানে না, যে রাবণকে বছরের পর বছর জ্বালিয়ে আসছে, সেই রাবণ-ই আমাদের শত্রু। বাবা বলছেন, আমি তোমাদেরকে শোক বাটিকা থেকে মুক্ত করে অশোক বাটিকাতে নিয়ে যেতে এসেছি, ওখানে কেউ বিষম খায় না। এখানে অনেক রকম ভাবে বিষম খায়। মা-বাবা-পতি কিংবা সন্তানদের জন্য বিষম খেতে থাকে। পতি বিকারের জালে ফাঁসিয়ে দেয়। বাবা এসে এই সকল বিষম খাওয়া থেকে উদ্ধার করে নতুন দুনিয়াতে নিয়ে যান। আত্মার পাখা (ডানা) এখন ভেঙে গেছে। তাই আত্মা উড়তে পারছে না অর্থাৎ স্মরণের যাত্রা করতে পারছে না। এটা হল বুদ্ধিযোগের যাত্রা। লেখাও আছে 'মন্মনা ভব'। কিন্তু এর অর্থ যে যাত্রা করা সেটা কেউই বোঝে না। কাহিনীতে আছে, রামের বানর সেনা ছিল যারা সেতু বানিয়েছিল। কিন্তু বানররা কিভাবে সেতু বানাবে। এখন তোমাদের স্মরণের যাত্রার দ্বারা সেতু তৈরি হচ্ছে যে সেতুর মাধ্যমে তোমরা বিষয় বৈতরণী নদী পার হচ্ছ। বাবা এই নদীতে সাঁতার কাটতে শেখাচ্ছেন। তিনি তো মাঝি, তাই না? তিনি বিষয় বৈতরণী নদী থেকে পার করিয়ে শিবালয়ে নিয়ে যান। বলা হয়, অমৃত না খেয়ে বিষ খেয়েছ কেন? অমৃত অর্থাৎ জ্ঞানামৃত। জ্ঞানের দ্বারাই সদগতি হয়। শাস্ত্রগুলোকে জ্ঞান বলা যাবে না। সেসব হল ভক্তিমার্গের সামগ্রী। শাস্ত্র পড়লে সত্যযুগে আসা যায় না অর্থাৎ সদগতি হয় না। তাই সেগুলোকে জ্ঞান বলা যাবে না, সেসব হল ভক্তি। জ্ঞানমার্গে প্রথমে ১০০ শতাংশ সদগতি হয়, তারপর ধীরে ধীরে নীচে নামতে থাকে। এমন নয় যে সত্যযুগেও দুর্গতি হয়। ওখানে তো দুর্গতির নামই নেই। কলিযুগে সকলের দুর্গতি হয়। তোমরা জানো, কেবল বাবা-ই সকলের ওপর দয়া করেন। তাঁকেই শ্রী শ্রী বলা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে সকলের নামের সাথেই শ্রী শ্রী টাইটেল (উপাধি) জুড়ে দেয়। দেবতাদেরকে শ্রী বলা হয়। শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ, শ্রী রাম-সীতা

এবং যিনি এইরকম শ্রী (শ্রেষ্ঠ) বানান তাঁকে শ্রী শ্রী বলা হয়। তোমরা বাবার সামনে প্রতিজ্ঞা কর যে আমরা কখনো বিকারে লিপ্ত হব না। যদি প্রতিজ্ঞা করার পরেও কোনো ভুল করে ফেল তাহলে ধর্মরাজ আছেন যিনি হলেন বাবার রাইট হ্যান্ড (ডান হাত)। তিনি ক্ষমা করবেন না। বাবাও গুপ্ত, জ্ঞানও গুপ্ত এবং প্রাপ্তিও গুপ্ত। কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানো যে কোনো মানুষ আমাদেরকে শ্রীমৎ দেয় না। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা বাবা রচনা করেন। প্রজাপিতা সূক্ষ্মবতনে থাকবে না, নিশ্চয় এখানেই থাকবে। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ যে প্রজাপিতা ব্রহ্মা এখন ব্রাহ্মণ। ভবিষ্যতে ইনি-ই বাদশাহী পান। দেবতারা তো পতিত দুনিয়াতে রাজত্ব করবে না। তাই পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হতে হবে এবং সেটা অবশ্যই হবে। এখনও কিছু সময় বাকি আছে। এখনও তোমাদের নতুন বৃক্ষের (কল্পের) চারা রোপন সম্পূর্ণ হয়নি। আগে গায়ন করত - 'তুমি-ই হলে মাতা, তুমি-ই হলে পিতা'... কিছু না বুঝে সকলের সামনেই এইরকম গুণগান করত। আচ্ছা, বিচার করে দেখ যে ব্রহ্মা কিভাবে মাতা হবেন। লক্ষ্মী-নারায়ণেরও তো নিজস্ব রাজত্ব ছিল, তাই ওদেরকেও মাতা-পিতা বলা যাবে না। বর্তমান সময়ে পরমপিতা পরমাত্মা প্র্যাক্টিক্যালে (বাস্তবে) মাতা-পিতার ভূমিকা পালন করছেন। পরে ভক্তিমার্গে তাঁর মহিমার গায়ন করা হয়। শুরুতে কেবল শিববাবার সামনেই 'তুমি-ই হলে মাতা, তুমি-ই হলে পিতা' গায়ন করত। পরবর্তীকালে লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাম-সীতা সবার ক্ষেত্রেই এইরকম বলে দিয়েছে। বোধ-বুদ্ধি কিছুই নেই। শিববাবা হলেন স্যাকারিন । আসুরী মতে চলার ফলে সকল মানুষ কেবল দুঃখই দেয়। কিন্তু আমি সবাইকে সর্বাধিক সুখ দিই। আমি হলাম দাতা। বাচ্চারা, তোমাদের প্রতি আমার শ্রীমৎ হল - তোমরা যত স্মরণের যাত্রা করবে, স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাবে, পদ্মফুলের মত হবে - তত উঁচু পদ পাবে। এই অলংকারগুলোর অর্থ কেউই বুঝতে পারে না। তোমরাই অলংকার ধারণ কর, কিন্তু বিষ্ণুর হাতে দেখিয়ে দিয়েছে। তৃতীয় নয়নও দেবতাদের ক্ষেত্রে দেখিয়েছে। বাস্তবে তোমাদেরই তৃতীয় নয়নের প্রাপ্তি হয়, ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী... ইত্যাদি বলা হয়। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন এই শব্দগুলোর অর্থ রয়েছে। আত্মার বুদ্ধিতেই সবকিছু থাকে। শরীর এইরকম বলে না যে আমার নাক, আমার কান, আমার চোখ...। আত্মাই বলে - এটা হল আমার শরীররূপী মহল। আত্মার স্মৃতি এসেছে যে আমার মধ্যে অর্থাৎ আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। এটা খুবই গুপ্ত কথা। আত্মাকে রকেটও বলা হয়। শরীর ছাড়ার পর আত্মা এক সেকেন্ডে লন্ডনে চলে যেতে পারে। ওরা এত দ্রুতগামী রকেট বানিয়েছে যাতে করে সকালে যাত্রা শুরু করলে সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছে যাবে। আগে স্টিমারে ৩-৪ মাস সময় লেগে যেত, এখনও ১ মাস সময় লেগে যায়। এরোপ্লেনে একদিন সময় লাগে। কিন্তু আত্মা খুবই দ্রুতগামী রকেট যেটা এক সেকেন্ডে পৌঁছে যায় এবং কেউ দেখতেও পায় না। তোমরা আত্মারা হলে অলরাউন্ড পার্টধারী। আচ্ছা, পরমাত্মার ভূমিকা কি? দ্বাপর থেকে আমার সাক্ষাৎকার করানোর পার্ট আছে। যে যেমন ভাবনা নিয়ে আমাকে স্মরণ করে, তার মনস্কামনা পূরণ করে দিই। এখন আমার জ্ঞান দেওয়ার পার্ট অর্থাৎ পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর পার্ট। তোমাদেরকে নলেজফুল (জ্ঞানী) গডের সন্তান মাস্টার গড বানাই। যে আগের কল্পে পুরুষার্থ করেছিল, সে-ই আবার করবে। বাচ্চারা বলে, আগের কল্পেও এসেছিলাম এবং এখন পুনরায় উত্তরাধিকার নিচ্ছি। কার কাছে? মাতা-পিতার কাছে। সরস্বতী হলেন সকলের মাতা। আবার সরস্বতীর মাতা হলেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মার কোনো মাতা নেই। শিববাবা স্বয়ং বলেন - তুমি হলে আমার পত্নী। তখন আমিও বলি যে পতিকে ছাড়া আমি কিভাবে খাব। আচ্ছা, তাহলে শিববাবা আর আমি একসাথে খাব। নেশা তো থাকবেই। তোমরা নিজেরাও বল যে বাবা দালাল রূপে এসেছেন তাঁর নিজের সাথে বিয়ের আশীর্বাদ করানোর জন্য। পন্ডিতরা বিকারের যে বন্ধন বেঁধেছে সেটাকে বাবা বাতিল করে দেন। বাবা বলেন, তুমি জ্ঞান-চিতার ওপর বসলে গৌরবর্ণ হবে। তাহলে কাম-

চিতার ওপরে বসে মুখ কালো করছ কেন? শ্যাম-সুন্দর কথার অর্থও তোমরা জানো। শ্রীকৃষ্ণ সুন্দর ছিল, এখন সেও শ্যামবর্ণ হয়ে গেছে। এখন বাবা এসে তাঁর পরিচয় দিচ্ছেন। তোমরা হলে পতিত-পাবন গড ফাদারের স্টুডেন্ট। তাই এটা হল পাঠশালা। পাঠশালাতে পড়াশুনা হয়, পরিশ্রম করা হয়। সৎসঙ্গে কোনো পরিশ্রম করতে হয় না। ওখানে তো গীতা ইত্যাদি গ্রন্থপাঠ শুনে ঘরে চলে যায়। ওখানে তো কেউই বলে না যে পবিত্র হও, যাত্রা কর। ভবিষ্যতে এইসব শারীরিক যাত্রা বন্ধ হয়ে যাবে। বরফ পড়লে কিংবা কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে কেউই যাবে না, কারণ তোমাদের যাত্রা ক্রমশ দ্রুত হতে থাকবে। আমাদের এই যাত্রা শিবালয়ের দিকে। প্রথমে শিববাবার নিবাসস্থান শিবালয়ে যাব। তারপর শিববাবা যে শিবালয়ের স্থাপন করছেন (স্বর্গ) সেখানে যাব। শিবপুরী এবং বিষ্ণুপুরী উভয়কেই শিবালয় বলা হয়। কারণ শিববাবা মুক্তি এবং জীবনমুক্তি দুটোই দেন। শিববাবা সত্যযুগী দৈবী ঘরানার স্থাপন করেন।
আচ্ছা, স্মরণের সময়ে তো আওয়াজের জন্য বিঘ্ন পড়ে না। জ্ঞান শোনার সময়ে শোরগোল হলে বিঘ্ন আসে। মানুষ বলে, পরিবেশ শান্ত কর নাহলে স্মরণে বিঘ্ন পড়বে। কিন্তু যোগের সময়ে আওয়াজের জন্য বিঘ্ন আসে না। তখন মায়া বিঘ্ন দেয়। বাচ্চাদের সাথে মায়ার যুদ্ধ। এই যুদ্ধের ময়দানে বাচ্চাদেরকে হেরে গেলে চলবে না। মায়া ঘুঁষি মারতেই থাকে। যদি নাকে ঘুঁষি মেরে দেয় তাহলে পড়ে যায়। তারপর আবার উঠে পড়ে। কিন্তু পুনরায় নাকে মারলে আবার পড়ে যায়। বাবা বলছেন, মায়া এইরকম কাম-ক্রোধের ঘুঁষি মারে। এর থেকে অনেক সাবধানে থাকতে হবে। ঘুঁষি খাওয়া যাবে না। আচ্ছা!
মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) জ্ঞানের সকল অলংকার ধারণ করে স্ব-দর্শন চক্রধারী, ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী অর্থাৎ মাস্টার গড হতে হবে।

২) বাবার রাইট হ্যান্ড (ডান হাত) ধর্মরাজের কথা মনে রেখে কোনো বিকর্ম করো না। পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করার পরে বিকারের বশীভূত হওয়া উচিত নয়।

বরদান:- ব্রাহ্মণ জীবনে সর্বদা খুশির খোরাক খেয়ে এবং খাইয়ে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান হও।

আমরা হলাম বিশ্বের মালিকের বালক তথা মালিক। এই ঈশ্বরীয় নেশা এবং খুশিতে থাক। বাঃ আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য। সর্বদা এই খুশির দোলনায় দুলতে থাক। সর্বদা খুশনসীব (ভাগ্যবান) থাক এবং নিজে সর্বদা খুশির খোরাক খেয়ে অন্যকেও খাওয়াও। অন্যকেও খুশির মহাদান করে খুশনসীব (ভাগ্যবান) বানিয়ে দাও। তোমার জীবনটাই হল আনন্দময়। খুশিতে থাকাই হল জীবন। এটাই হল ব্রাহ্মণ জীবনের শ্রেষ্ঠ বরদান।

স্লোগান:- যেকোনো পরিস্থিতিতেই সহনশীল হলে আনন্দের অনুভূতি করতে থাকবে।

মাতেশ্বরীজীর অমূল্য মহাবাক্য:-
(23-01-57)

এখন তো গোটা দুনিয়া জানে যে পরমাত্মা হলেন এক। সেই পরমাত্মাকেই কেউ শক্তি বলে মানে, কেউ আবার প্রকৃতি বলে। অর্থাৎ কোনো না কোনো রূপে অবশ্যই মানে। যে রূপেই মেনে থাকুক, নিশ্চয়ই তিনি আছেন বলেই তাঁর বিভিন্ন নাম দিয়েছে। কিন্তু পৃথিবীতে যত প্রকারের মানুষ আছে, সেই একজনের সম্বন্ধে তত প্রকারের মত রয়েছে। কিন্তু তিনি আসলে অদ্বিতীয়। এইসকল মতামতের মধ্যে চারটি মুখ্য মত শোনাচ্ছি - কেউ বলে সব জায়গাতেই ঈশ্বর রয়েছেন, কেউ-কেউ বলে ব্রহ্ম সব জায়গাতে আছে অর্থাৎ সর্বত্র কেবল ব্রহ্ম আর ব্রহ্ম। কেউ বলে ঈশ্বর সত্য এবং মায়া মিথ্যা। আবার কেউ বলে- ঈশ্বর বলে কিছু নেই, প্রকৃতিই সব। ওরা ঈশ্বরকে মানে না। এই সকল মত প্রচলিত আছে। ওরা মনে করে জগৎ মানে প্রকৃতি, এছাড়া আর কিছুই নেই। তাহলে দেখ, জগৎকে মানে কিন্তু যে পরমাত্মা এই জগতের রচনা করেছেন সেই জগতের মালিককেই মানে না! দুনিয়াতে যত মানুষ রয়েছে ততগুলো মত প্রচলিত আছে। অবশেষে পরমাত্মা এসেই এইসকল মতামতের ফয়সালা করেন। পরমাত্মা এসেই এই সমগ্র জগতের বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেন। অর্থাৎ যিনি সর্বশক্তিমান তিনিই নিজের রচনার সিদ্ধান্ত বিস্তারিত ভাবে বোঝান। তিনিই আমাদেরকে রচয়িতার পরিচয় দেন এবং তারপর নিজের রচনার পরিচয়ও দেন। কেউ কেউ প্রশ্ন করে - আমি যে আত্মা তার কি কোনো প্রমাণ আছে? এক্ষেত্রে তাকে বোঝানো হয় - আমরা যখন বলি যে আমি আত্মা হলাম পরমাত্মার সন্তান, তখন এই বিষয়ে নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত। আমরা যে সারাদিন 'আমি' 'আমি' বলি, সেটা কোন শক্তি বলে এবং যাঁকে আমরা স্মরণ করি তিনি আমাদের কে হন? যখন কাউকে স্মরণ করা হয় তখন নিশ্চয়ই তাঁর কাছ থেকে কিছু পাওয়ার থাকে। সর্বদা তাঁকে স্মরণ করলেই তাঁর দ্বারা আমাদের প্রাপ্তি হবে। মানুষ যা কিছু করে তার জন্য মনের মধ্যে কোনো না কোনো শুভ ইচ্ছা অবশ্যই থাকে। কারো সুখ পাওয়ার ইচ্ছা থাকে, কারো শান্তি পাওয়ার ইচ্ছা থাকে। যেহেতু পাওয়ার ইচ্ছা উৎপন্ন হয় তাই সে নিশ্চয়ই প্রাপ্তি নেয়, এবং যার দ্বারা সেই ইচ্ছা পূরণ হয় তিনি নিশ্চয়ই কিছু দিয়ে থাকেন, সেই জন্যই তাঁকে স্মরণ করা হয়। এখন এই রহস্যটাকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে হবে যে তিনি কে? যে শক্তি কথা বলছে সেই শক্তিটা হলাম স্বয়ং আমি অর্থাৎ আত্মা, যার আকার জ্যোতির্বিন্দুর মত। মানুষ এই স্থূল শরীর ত্যাগ করার সময়ে আত্মা বেরিয়ে যায়। হয়তো এই চোখ দিয়ে দেখা যায় না। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে আত্মার কোনো স্থূল আকার নেই কিন্তু মানুষ অনুভব করতে পারে যে আত্মা বেরিয়ে গেছে। এই জ্যোতির্বিন্দু আত্মাকে আমরা কেবল আত্মা-ই বলব। তাহলে এই আত্মাকে যিনি জন্ম দিয়েছেন, সেই পরমাত্মার রূপ আত্মার মতোই হবে। যে যেমন হয়, তার রচনাও সেইরকম হয়। তাহলে পরমাত্মার সম্মন্ধে আমরা আত্মারা কেন বলি যে তিনি আমাদের অর্থাৎ সকল আত্মার থেকে পরম। কারণ তাঁর ওপর মায়ার কোনো আস্তরণ নেই। কিন্তু আমাদের অর্থাৎ অন্যান্য আত্মাদের ওপর অবশ্যই মায়ার আস্তরণ পড়ে। কারণ আমরা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসি। এটাই হল আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।